বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ

বিনয় ঘোষ

বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' বাঙালী সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমাদের সংস্কৃতির 'ট্রেট' বা লক্ষণ হিসেবে তার উৎস সন্ধানে যাত্রা করলে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছানো যায়—ইংরেজ, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈদিক প্রভৃতি যুগ একটার পর একটা পার হয়ে আর অনেক দূরে, একেবারে সেই নিষাদযুগ পর্যন্ত, গ্রাম্য - জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয় যখন। যুগে যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সংঘাতে আমাদের গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনের এই প্রতীক তার সংজ্ঞা ও রূপ বদলেছে, এককালে 'চণ্ডীমণ্ডপ' নাম ধারণ করেছে, কিন্তু কোনোকালেই তার সর্বজনীনত্ব একেবারে হারিয়ে ফেলেনি। এমনকি মধ্যযুগের রাজারাজড়া ও জমিদারদের আমলেও না। অবশেষে 'চণ্ডীমণ্ডপ' অনেকক্ষেত্রে হয়ত শুধু দুর্গোৎসবের জন্য 'দুর্গামণ্ডপে' পরিণত হয়েছে, কিন্তু তবু তার আশেপাশে সেদিন পর্যন্ত আমরা সংঘজীবনের বিলীয়মান স্পন্দন অনুভব করছি। আজ আর চণ্ডীমণ্ডপের কোনো চিহ্ন নেই বাংলার কোনো গ্রামে। যা দু'একটা আছে তাও নিশ্চিত ধ্বংসের পথে। দেবতার মন্দিরও নয় অট্টালিকা বা প্রাসাদও নয়, সুতরাং প্রত্নতত্ত্ববিদদের কোনো কৌতূহল নেই 'চণ্ডীমণ্ডপ' সম্বন্ধে এবং নমুনা হিসেবে 'চণ্ডীমণ্ডপ সংরক্ষণের ইচ্ছাও নেই। তাই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন আজ আমরা প্রায় একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা 'চণ্ডীমণ্ডপ' হয়ত একশোটা 'মন্দিরের' চেয়েও বেশি। ঐতিহাসিক উপকরণ জোগাতে পারত, এমনকি বিশেষ করে সেকালের বর্ধিষ্ণু (এককালের ক্ষয়িষ্ণু) গ্রামগুলিতে, দু-একটা চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসোন্মুখ কাঠামোও ভবিষ্যতের সন্ধানী ঐতিহাসিকদের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে। আর দু-চার বছর পরে তা্য সম্ভব হবে না। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ বাঙালী জীবনের একটা ঐতিহাসিক চিহ্ন হিসেবে বাংলাদেশে থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে একটা যুগের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অন্যতম স্মৃতিচিহ্নও একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু একটা যুগেরও বা কেন? বলা যেতে পারে, যুগ-যুগান্তরের গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনের সর্বশেষ প্রতীকচিহ্ন ধ্বংস হয়ে যাবে।

নাগাদের 'মোরুং' সম্বন্ধে (নাগা গ্রামের সর্বসাধারণের গৃহক 'মোরুং' বলে— ক্লাবঘর, উৎসবগৃহ, অতিথিশালা, আলোচনাগৃহ সবই বলা চলে' কোনো নৃবিজ্ঞানী বলেছেন যে, 'ক্ষয়িষ্ণু মোরুং হল ক্ষয়িষ্ণু নাগা গ্রামের প্রতীক।' বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কলরবমুখর জমকালো চণ্ডীমণ্ডপ হল মুখর গ্রাম্যজীবনও জীবন্ত লোকসংস্কৃতির প্রতীক। আজ তার কোনো চিহ্ন নেই কোনো সুদূর পল্লীগ্রামেও। ধ্বংসোন্মুখ নিস্তব্ধ 'চণ্ডীমণ্ডপ' মানে ধ্বংসোন্মুখ মুমূর্ষু গ্রাম, যার সংখ্যা বাংলাদেশে আজ সবচেয়ে বেশি। চণ্ডীমণ্ডপশূন্য গ্রাম মানে আসল সংঘবদ্ধ গ্রাম্যজীবনশূন্য গ্রাম, লোকোৎসব ও লোকসংস্কৃতির প্রায় যাবতীয় স্মৃতিচিহ্নশূন্য গ্রাম্য, অর্থাৎ মরুভূমির মতন শূন্য পরিত্যক্ত প্রাণহীন গ্রাম। এরকম গ্রামের সংখ্যাও বাংলাদেশে আজ অল্প নয়। চণ্ডীমণ্ডপের ইতিহাস তাই বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা সুদীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। এখানে সেই ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবু প্রায়লুপ্ত সেই কাহিনী অন্তত কিছুটা পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করা যাক। ফাঁকগুলো বিশেষজ্ঞরা ভরাট করে নেবেন এবং আগাগোড়া একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সন্ধানীরা একদিন নিশ্চয় রচনা করবেন।

চণ্ডীমণ্ডপ নাম কেন?

মানিকচাঁদের গীতে 'শীতল মন্দির ঘর' ও 'বাঙ্গলা ঘরের' কথা পাওয়া যায়, 'মণ্ডপ' বা 'চণ্ডীমণ্ডপ' বলে কিছু পাওয়া যায় না। যেমন—

কার লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পড়ে কালী।

এ হল ঘরের কথা, কিন্তু, 'ঘর' ও 'মণ্ডপ' এক নয়। এ রকম ঘরের কথা পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। 'ভেলুয়া' নামক গীতিতে বণিকরাজ মুরাই-এর বাড়ি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা
আর সোনা দিয়ে মুড়াইছে মাথা রে।
... ... হাজার বাণিজ্য নায়
সাগর বহিয়া যায়
দেখিতে অতি চমৎকার রে।।

এ হল 'আটচালা' 'চৌচালা' 'বাঙ্গলা ঘরের' বর্ণনা। কিন্তু 'মণ্ডপ' কোথায়? কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মণ্ডপের কথা বলেছেন—

নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে
অনাথ মণ্ডপ অতিথিশালা
বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে,
প্রবাসী জনের তিথিমেলা।

ষোড়শ শতাব্দীর কথা। বাংলার বর্ধিষ্ণু নগর ও গ্রামের মধ্যে তখন শিবমণ্ডপ, অনাথমণ্ডপ, মন্দির, অতিথিশালা ইত্যাদি থাকত। 'মণ্ডপ' ও 'ঘর' এক জিনিস নয়, আগে বলেছি। রাজশেখর বসু তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানে 'মণ্ডপ' কথার অর্থ লিখেছেন—''ছাদযুক্ত প্রশস্ত চত্বর, চাঁদোয়া, পাণ্ডাল।'' উদাহরণ - স্বরূপ সভামণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ, ছায়ামণ্ডপ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন, নাটমন্দিরের কথাও বলেছেন। অর্থাৎ 'মণ্ডপ' চারদেয়ালযুক্ত ছাদওয়ালা ঘর নয়, উপরে চাল বা ছাদ দেওয়া উন্মুক্ত চত্বর বা প্রাঙ্গণ, খড়ের চালও হতে পারে, ইটের পাকা ছাদও হতে পারে। এইরকমের শিবমণ্ডপ, অনাথমণ্ডপ, বিষ্ণুমণ্ডপ যদি থাকে তাহলে চণ্ডীঠাকুরের জন্য 'চণ্ডীমণ্ডপ' থাকাটাও স্বাভাবিক। সুতরাং চণ্ডীঠাকুরের অবস্থান যেখানে, সেখানে যদি কোনো নাটমন্দির চাওওয়ালা মণ্ডপ তৈরি করা হয়, তাহলে তাকে চণ্ডীমণ্ডপ বলা যেতে পারে। এইভাবেই চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি হয়েছে মনে হয়।

চণ্ডী দেবী ও চণ্ডীমণ্ডপ

বাংলাদেশের লৌকিক শক্তিদেবতার মধ্যে চণ্ডীই বোধহয় প্রাচীনতম। বাংলার গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন নামে তিনি পূজিত হন— যেমন উড়োনচণ্ডী, শুভচণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। চণ্ডী ভীষণা-প্রকৃতির বলে তাঁকে 'মঙ্গলচণ্ডী' নামে তোষণ করার চেষ্টা। এই যে 'চণ্ডী' ইনি কাদের দেবতা? বাংলার আদি অকৃত্রিম মাটির মানুষের সম্পূর্ণ নিজেদের পরিকল্পিত এই 'চণ্ডী' দেবতা। বৈদিক ঋষি বা হিন্দু পুরাণকারদের কল্পনার সৃষ্টি তিনি নন। বেদ উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ বা প্রাচীন পুরাণে 'চণ্ডী'র উল্লেখ নেই। বেশ বোঝা যায়, বহুকাল ধরে এ অসভ্য অনার্যদের দেবতা শাস্ত্রকার ও পুরাণকারদের কাছে উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা ছিলেন। পরবর্তীকালের কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণে, যেমন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদিতে চণ্ডী দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রথমে সম্পূর্ণ উপেক্ষিতা থাকলেও, পরে তিনি হিন্দুসমাজের সকল স্তরের লোকের আরাধ্যা দেবী বলে গণ্য হয়েছেন। চণ্ডী যে আর্যপূর্ব লোকসমাজের দেবতা ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ্য কিছু পাওয়া যায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওরাওঁদের মধ্যে আজ্য 'চণ্ডী' নামে এক দেবতার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই 'চণ্ডী' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র রায় বলেছেন, — "This is the deity par excellence of unmarried young Oraons"ওরাওঁরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী কিন্তু দৈহিক গঠনে আদি - অস্ত্রালসদৃশ। অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদের প্রধান উপাস্য দেবতাই হলেন 'চণ্ডী'। চাণ্ডী'। চাণ্ডী স্ত্রীদেবতা এবং তাঁর মূর্তি হল স্বাভাবিক একখণ্ড শিলামূর্তি। আদিম শিলাপূজার পরিষ্কার নিদর্শন। প্রধানত 'চণ্ডী' হলেন বন্যপশুর দেবতা, শিকারের দেবতা। ওরাওঁ যুবকরা যখন শিকারে যায় তখন তারা একখণ্ড 'চাণ্ডীশিলা' নিজেদের সঙ্গে রাখে, কারণ তাদের বিশ্বাস তাতে শিকারের সাফল্য প্রায় নিশ্চিত। মাঘী পূর্ণিমাতে চাণ্ডীদেবীর বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়। বাইরের কোনো পুরোহিত পূজা করেন না, সমবেত ওরাওঁ যুবকদের মধ্যে একজনকে 'পাহান' বা সেদিনের অনুষ্ঠানের পরিচালক নির্বাচন করা হয়। সাত - আট দিন আগে থেকে পূজার আয়োজন চলতে থাকে এবং ভোজ্য, নৃত্য - গীত উৎসবের মধ্যে পূজানুষ্ঠান শেষ হয়।

ওরাওঁরা দুদিকে মুণ্ডা ও হিন্দু প্রতিবেশীদের মধ্যে থাকে বলে হয়ত অনেকে বলতে পারেন যে, চাণ্ডীদেবী হিন্দুদের কাছ থেকে তারা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ হিন্দু 'চণ্ডী' হয়েছেন ওরাওঁ 'চণ্ডী'। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্য ওরাওঁদের মধে পড়েছে, দেবদেবীদের মধ্যেও পড়েছে। ওরাওঁদের 'দেবী মাই' হলেন এইধরনের হিন্দু দেবী, ওরাওঁদের মধ্যে এসে ইনি মাটির আবক্ষ নারীমূর্তি ধারণ করেছেন এবং ওরাওঁদের অন্যান্য দেবদেবীর মতন ইনি গাছতলায় মুক্তস্থানে বাস করেন না, ঠিক মন্দিরে না হলেও চালের তলায় বাস করেন। বেশ বোঝা যায়, ইনি ওরাওঁদের নিজেদের দেবতা নন, পাশের হিন্দুসমাজের দেবতা চেহারা ও বসবাসের মধ্যে উচ্চসমাজের যৎকিঞ্চিৎ আভিজাত্যের ছাপও পড়েছে। কিন্তু চাণ্ডীদেবী কখনই তা নন, তাঁর আদি অকৃত্রিম রূপ আজও তাঁর শিলামূর্তির মধ্যে প্রকট এবং মন্দিরের বদলে আজ্য মুক্তস্থানে গাছতলায় বিরাজ করে তিনি সেই আদিমতা ও অকৃত্রিমতার সাক্ষী দিচ্ছেন। তাঁর পূজানুষ্ঠানের মধ্যেও হিন্দুত্বের ছাপ নেই। 'পাহান' ও 'পুরোহিতের' মধ্যে কোনো আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং, নিঃসন্দেহে চাণ্ডীদেবীকে আর্যপূর্ব কোনো দ্রাবিড় ভাষাভাষী বা অষ্ট্রিক ভাষাভাষীর আরাধ্য দেবী বলা যেতে পারে।

বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে দুটি কাহিনী আছে তার মদ্যে একটির নায়ক হল ব্যাধ- যুবক কালকেতু এবং চণ্ডীও হলেন শিকারীদের দেবতা। ওরাওঁদের চাণ্ডীর মতন এই চণ্ডীও বিচিত্র রূপধারণে অত্যন্ত পারদর্শী। এককথায়, কালকেতু - পূজিত চণ্ডী বনের দেবতা, বন্যপশুর দেবতা, শিকারীর দেবতা। দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক ধনপতি সদাগর এবং চণ্ডীও হলেন গৃহপালিত পশুর দেবতা, ঘরের দেবতা, বন্যপশু নয়, ঘট বা ঝারি, দূর্বা ও ধান হল তাঁর পূজার প্রতীক। সভ্যতার দুটি স্তরে একই চণ্ডী দেবতার রূপান্তরের ইঙ্গিত এখানে বেশ স্পষ্ট। যাযাবর শিকারীদের সব্যতার স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে চণ্ডীদেবী রূপান্তরিত হয়েছেন। সহজে হতে পারেননি, অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পর তবে তিনি উচ্চবিত্ত সমাজে গৃহীত হয়েছেন। তারও ইঙ্গিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে স্পষ্ট। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করতে দেখে ধনপতির কাছে লহনা গিয়ে বলছে—

তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনীকলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা

ধনপতি চণ্ডীপূজায় ক্রুদ্ধ হয়ে কি করেছেন?

এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লঙ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে।।
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।
কেমন দেবতা এই পূজিস ঘট ঝারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি।

ডাইনীকলা হল প্রাগার্যদের 'Magic'ও 'Witchcraft এবং খুল্লনা তা জানে। সদাগরের স্ত্রী হয়েও খুল্লনা চণ্ডীপূজার প্রাচীন ঐতিহ্য ছাড়তে পারেনি। ধনপতি আর্যসমাজের প্রতিনিধি এবং ঘরের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, সেটা বাইরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। এরকম প্রতিচ্ছবির ছড়াছড়ি 'পুরাণের' মধ্যে। সেখানেও ঋষিদের সঙ্গে ঋষিপত্নীদের বিরোধ, চণ্ডীর বদলে উলঙ্গ অনার্যদেবতা শিব বা শিশ্নদেবকে নিয়ে। এ সবই হল আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই, আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির লেনদেনের মধ্যে দিয়ে, পরবর্তীকালে 'হিন্দু সংস্কৃতির' সুসমঞ্জস, সুসমন্বিত রূপ ফুটে উঠেছে। শিব ও চণ্ডী উভয়ের সসম্মানে গৃহীত হয়েছে বৃহত্তর লোকসমাজে। এই চণ্ডীই শেষে দুর্গা, নারায়ণী, ইশানী, শিবা, সতী, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, গৌরী, পার্বতী হয়েছেন। শিবদুর্গা, হরপার্বতী, উমা-মহেশ্বরের মতন লোকপ্রিয় দেবদেবী আর কেউ বাংলাদেশে আছেন বলে মনে হয় না। চণ্ডীই যে দুর্গা, আজও আমাদের দুর্গোৎসবের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণে বলা হয়েছে এই মঙ্গলচণ্ডী "মূর্তিভেদেন সা দুর্গা"। আগে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় তাই দুর্গা প্রতিমার সামনে মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী বা চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করা হত এবং এখনও হয়ে থাকে।

কিন্তু এ তো গেল চণ্ডীদেবীর প্রাচীনত্বের কথা। চণ্ডীমণ্ডপও কি এই চণ্ডীদেবীর মতন প্রাচীন? তা মনে হয় না। চণ্ডীদেবীর

সাক্ষাৎ যখন থেকে পাওয়া যায়, তখন থেকে এমন কোনো 'মণ্ডপে'র পরিচয় পাওয়া যায় না য তলায় বা সামনে তিনি বাস করেন। মণ্ডপ অনেক পরে তিনি হয়েছে। তাই মনে হয়, চণ্ডী আর্যপূর্ব যুগের দেবতা হলেও, আর্য-অনার্য উপাদানে সংমিশ্রিত ও সমন্বিত হিন্দু সংস্কৃতির এক অপূর্ব কীর্তিচিহ্ন এই 'চণ্ডীমণ্ডপ'। মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির সেই অন্যতম কীর্তিস্তম্ভ আজ বিলীয়মান।

ওরাওঁদের চাণ্ডী কোনো মণ্ডপের তলায় বাস করেন না, উৎসবানুষ্ঠানের জন্য তাঁর সামনেও কোনো মণ্ডপের চিহ্ন দেখা যায় না। প্রত্যের ওরাওঁ পল্লীতে কোনো পর্বতের ঢালু জায়গায় 'চাণ্ডী' টাঁড়' নাম এক বা একাধিক স্থান থাকে, সেখানেই প্রাকৃতিক একখণ্ড পাথরের মধ্যে চাণ্ডীদেবী বিরাজ করেন। তাঁর বসবাসের জন্য মন্দির বা মণ্ডপ নেই। সাধারণত উন্মুক্ত স্থানে। গাছতলায় এই চাণ্ডী টাঁড়। এমনকি, ওরাওঁদের 'দেবী মাইয়ের' যে বাসস্থান তাও নামমাত্র দেয়ালশূন্য একটা চালাঘর, মন্দির তাকে কিছুতেই বলা যায় না, মণ্ডপও না। সুতারাং চণ্ডীমণ্ডপ পরবর্তীকালের কীর্তি বলে মনে হয়, চাণ্ডীদেবী যখন 'চণ্ডী' হয়ে সাধারণ হিন্দুসমাজের আরাধ্য দেবী হয়েছেন তখনকার।

এখন প্রশ্ন হল, চাণ্ডীদেবী কোন্ সময় থেকে সাধারণ হিন্দু সমাজের পূজ্য দেবী হয়েছেন? মোটামুটি সেই সময় থেকেই যে চণ্ডীমণ্ডপের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া শক্ত। অবশ্য অলিখিত ইতিহাসের অনেক বিষয়ের উত্তরই সঠিকভাবে দেওয়া চলে না। তাতে কিছু আসে যায় না, সম্ভাব্যকালের মোটামুটি একটা নির্দেশ পেলেই যথেষ্ট। প্রশ্নের উত্তর দুই দিক দিয়ে দেওয়া যায়— প্রথমত সাহিত্যিক প্রমাণের দিক দিয়ে, দ্বিতীয়ত শিল্পকলার নিদর্শনের দিক দিয়ে।

সাহিত্যিক প্রমাণের কথা বলি। চৈতন্যের সমসাময়িক কবি 'চৈতন্যভাগবতকার' বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন

ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।

পাতকী জগাই মাধাই একদিন

প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতের কথা বলেও কবি অন্যত্র বলেছেন

মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে ঘরে ঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে।।

এ হল পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর কথা। এইসময় যেমন মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা জানা যায়, তেমনি যোগীপাল মহীপাল ভোগীপাল গীতের কথা, মদ্য মাংসে দানবপূজা ও যক্ষপূজার কথা, এবং দুর্গোৎসবের কথাও জানা যায়। রাত জেগে মঙ্গলচণ্ডীর গীত শোনার জন্য 'চণ্ডীমণ্ডপ'ও যে ছিল তাও অনুমান করা যায়। কিন্তু দুর্গোৎসবের প্রবর্তন হয়েছে যে সময় থেকে, তখন থেকে চণ্ডীমণ্ডপও এই উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে মনে হয়। সুতরাং চৈতন্যের কালে 'চণ্ডীমণ্ডপ' তো ছিলই, মঙ্গলচণ্ডীর গীত ছাড়াও সেই চণ্ডীমণ্ডপের প্রধান লোকোৎসব বোধহয় দুর্গোৎসবই হয়েছিল। কথা হচ্ছে, তারও আগে এমন কোনো সময় ছিল কিনা যখন 'চণ্ডীমণ্ডপ' প্রধানত মঙ্গলচণ্ডীর গীতোৎসবের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। স্বয়ং চণ্ডীই যদি পরে দুর্গা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর চণ্ডীমণ্ডপও যে ধীরে ধীরে গ্রামের দুর্গোৎসবের প্রধান মিলনকেন্দ্রে পরিণত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তার সাহিত্যিক প্রমাণও আছে। বাংলাদেশে মৃন্ময়ী দুর্গার পূজা খুব বেশি দিনের পুরনো বলে মনে হয় না। যাঁরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন তাঁর শূলপাণিকৃত 'দুর্গোৎসব বিবেক' উল্লেখ করে থাকেন। শূলপাণি চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দের লোক। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' লিখেছিলেন, তিনিও এই শতাব্দীর লোক। এঁদের আগে বাংলার ভবদেব ভট্ট দুর্গার মৃণ্ময়ী পূজার ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি একাদশ খ্রীস্টাব্দের লোক। ভবদেব কয়েকজন পূর্ববর্তী স্মৃতিকারের নাম উল্লেখ করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন যে, দুর্গার প্রতিমাপূজার লিখিত নির্দশনও দশম খ্রীস্টাব্দের ওদিকে আর পাওয়া যায় না। লিখিত নিদর্শন বা নিবন্ধ থাকলেও দুর্গাপূজার প্রচল ছিল না। ধনবল না থাকলে দুর্গোৎসব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আনন্দনাথ রায় তাঁর 'বারভূঞা' গ্রন্থে বলেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচল হয়। এইসময় রাজা কংসনারায়ণ তাহেরপুরের (রাজশাহী) রাজ ছিলেন। রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শে তিনি সাড়ে - আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে শারদীয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন করেন। তাঁর দেখাদেখি বাদুড়িয়ার রাজা , তার আগে লোকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত, এবং আট দিনে সেই পূজা সম্পন্ন হত। খ্রীস্টীয় দশম থেকে থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই চণ্ডীপূজা হিন্দুসমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত হয় বলে মনে হয়। রাত্রি জেগে চণ্ডীর পালাগান শোনাবার জন্য এইসময় গ্রামের জনসাধারণের মিলন-চত্বর হিসেবে 'চণ্ডীমণ্ডপের' সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। তারপর প্রায় পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার হিন্দু জমিদারদের উদ্‌যোগে এই 'চণ্ডীমণ্ডপ' শারদোৎসবেরই প্রধান মিলনমন্দির হয়ে ওঠে। কিন্তু তা হলেও লৌকিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসেবে চণ্ডীমণ্ডপের প্রাধান্য কোনোদিন খর্ব হয়নি।

চণ্ডীমণ্ডপ শুধু উৎসবগৃহ নয়, সামাজিক লোকসভাগৃহও বটে

কেবল সংস্কৃতি- অনুষ্ঠান বা ধর্মানুষ্ঠানের সাধারণগৃহ চণ্ডীমণ্ডপ নয়। উৎসব - পার্বণের মিলনমন্দির চণ্ডীমণ্ডপের আরও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। 'চণ্ডীমণ্ডপ' হল গ্রামের সর্বসাধারণের আলোচনাসভা, মজলিশ ও আড্ডার ঘর, অতিথিশালা, বিচারালয়, এমনকি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্যন্ত। মধ্যযুগের বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' তার এই দ্বিতীয় লৌকিক বিশেষত্ব কোথা থেকে পেল? বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী প্রাগার্য জাতিগুলির মধ্যে এইধরণের একটি গ্রাম্য সাধারণগৃহ দেখা যায়, নাম 'ধুমকুড়িয়া' বা 'গীতিওড়'। ওরাঁও, মুণ্ডা, হো, খড়িয়া, বিড়হোড়, জুয়াঙ, ভুঁইঞা ইত্যাদি আদিম জাতির মধ্যে এই ধুমকুড়িয়া ও গীতিওড়ের প্রচল খুব বেশি। সাধারণত এই গৃহগুলি কুমার - কুমারীদের বাসগৃহ বলে পরিচিত হলেও প্রধানত এগুলি যাবতীয় সামাজিক কার্জকর্মের কেন্দ্র বলা চলে। প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে এইধরনের একটি করে ধুমুকুড়িয়া ও গীতিওড় একসময় ছিল, এখনও অনেক গ্রামে আছে। এই গৃহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এগুলি গ্রামের মধ্যেকার সবচেয়ে সুদৃশ্য ও সুন্দর গৃহ, স্থাপত্যের কারিগরিতে ও নির্মাণকৌশলে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরকম সুসজ্জিত গৃহও গ্রামের মধ্যে দ্বিতীয়টি নেই। শুধু যে বিহার উড়িষ্যা ছোটনাগপুরের

আদিম জাতিগুলির এইধরনের গৃহ আছে তা নয়, মধ্যপ্রদেশের মারিয়াদের, ত্রিবাঙ্গুরের মথুবন, মান্নন্ ও পালিয়ান গ্রামেও এইরকম গৃহ দেখা যায়। আসামের ইন্দো-মোঙ্গল জাতি নাগাদের 'মোরুং' এবং গারোদের 'নোক্পান্তে' এই ধরনের গ্রাম্য সাধারণগৃহ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বত্রই এই গৃহগুলি সবচেয়ে সুন্দর ও মজবুত করে তৈরি এবং গ্রামবাসীদের সাধারণ মিলনকেন্দ্র। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই মিলনগৃহ (ধুমকুড়িয়া, গীতিওড়, ঘোটুল, মোরুং, নোক্পান্তে ইত্যাদি) অস্ট্রিকভাষী, দ্রাবিড়ভাষী, না ইন্দোমোঙ্গল বা কিরাত জাতির দান, তা নিয়ে নৃতাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করে এখানে লাভ নেই। সে আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সাধারণ গৃহ প্রাগার্য গ্রাম্যসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের পরবর্তী গ্রাম্য সমাজের 'চণ্ডীমণ্ডপ' এই বৈশিষ্ট্যেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের পরবর্তী গ্রাম্য সমাজের 'চণ্ডীমণ্ডপ' এই বৈশিষ্ট্যেরই অন্যতম প্রতিমূর্তি। বৃদ্ধ লোক যাঁরা আজও জীবিত আছেন এবং যাঁরা সেকালের গ্রামে গ্রামে এই চণ্ডীমণ্ডপ দেখেছেন, তাঁদের কয়েকজনের মুখ থেকে যে বিবরণ শুনেছি তাতে এই সাদৃশ্যের কথা খুব বেশি করে মনে হয়। সে বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করব না। তার বদলে লিখিত ইতিহাস থেকে 'চণ্ডীমণ্ডপের' সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ এখানে দেব। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের বৈশিষ্ট্য এই বিবরণ থেকেই স্পষ্ট ফুটে উঠবে।

বাংলাদেশের একটি জেলার কথাই বলি, বীরভূম জেলা। বিশেষভাবে বীরভূম জেলা বেছে নেওয়ার কারণ হল তার ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষত্ব। যেসব আদিম জাতির কথা আগে বলেছি তাদের অনেকের প্রতিবেশী বীরভূম। তা ছাড়া সকলেই জানেন, সাঁওতাল পরগনাই আগে বীরভূমের অন্তর্গত ছিল, সাঁওতাল বিদ্রোহের পর তাকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র পরগনায় পরিণত করা হয়েছে। গৌরীহর মিত্র তাঁর ''বীরভূমের ইতিহাস'' গ্রন্থে বলেছেন:

> তখনকার দিনে প্রায় প্রতি গ্রামের মধ্যাংশে একটি করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। ইহা গৃহস্বামীর শারদ - উৎসব জন্য নির্মিত হইলেও, প্রায় সর্বত্রই গ্রামের সর্বসাধারণের মিলনমন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। এখানে গ্রামের সর্বসাধারণ অবসর সময়ে একত্র হইয়া নানারূপ জল্পনায় ও আলাপ - আলোচনায় সব অতিবাহিত করিত। ইহারই প্রাঙ্গণ-চত্বরে রামায়ণ, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতির গান, ভাগবতের কথকতা, কবির লড়াই, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের গান প্রভৃতি হইত। বিদেশি হইতে অপরিচিত অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাহারা চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয়লাভ করিয়া যথাযোগ্যভাবে সৎকৃত হইত। আবার স্থানাভাব ঘটিলে এই চণ্ডীমণ্ডপের পিনায় গুরুমশায়ের গ্রাম্য পাঠশালার অধিবেশ হইত। আবার হয়ত দেখিবেন— সেখানে বসিয়া কোন লেখক কোন সম্পন্ন গৃহস্থের জন্য প্রাচীন পুঁথির আদর্শ হইতে এক এক প্রস্থ রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভাগবত বা এইরূপ কোন পুঁথির দিনের পর দিন ধরিয়া অনুলিপি প্রস্তুত করিতেছে।...এই মিলনমন্দিরের প্রাঙ্গণ - চত্বরে শাক্ত - বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হইত। কেননা, এইখানেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথকথা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা রাসকীর্তন, চৈতন্যমঙ্গলের গান, চণ্ডীমঙ্গলের গাথা, ধর্মরাজের মাহাত্ম্য, মনসামঙ্গলের গান প্রভৃতি সমভাবেই অনুষ্ঠিত হইত এবং সাধারণের প্রত্যেকেই তারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইত। তখন কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব— তাহার ভেদাভেদের দুর্জয় পক্ষপাতিত্ব ছিল না। আবার এই চণ্ডীমণ্ডপে সর্বসাধারণের বৈঠকে গ্রামের মণ্ডল ও প্রদান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলে সমবেতভাবে গ্রাম্য অপরাধের বিচার করিত...।

'বীরভূমের ইতিহাস' লেখকের এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, পূর্বোক্ত ধুমকুড়িয়া, গীতিওড়, ঘোটুল, মোরং ইত্যাদির সঙ্গে বাংলার গ্রামের এই চণ্ডীমণ্ডপের সাদৃশ্য কতখানি। এ হল ব্যবহারিক (Functional) সাদৃশ্যের কথা। এ ছাড়া দুয়ের মধ্যে নির্মাণসাদৃশ্যও আশ্চর্য রকমের। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা' গ্রন্থে লিখেছেন : ''১১৭২ সালের নির্মিত পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার কড়িও প্রান্তে ক্ষোদিত যে হাতিশুঁড়া ও বাঘের মুখ দেখিয়াছি, একালের কোন বাঙালী ছুতারকে আর তত সুন্দর প্রস্তুত করিতে দেখি না। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্বের এক মাটি চণ্ডীমণ্ডপের চারিটি কাঁটালের খুঁটি ৫০ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি, এখনও স্পষ্ট মনে আছে, তাহার উপরে ক্ষোদিত অদ্ভুত কারুকার্য আর এদেশে দেখা যায় না।'' চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণের খরচ সম্বন্ধে লেখক অন্যত্র বলেছেন : ''আমার মত লোকেও শালের কাঠ (পাকা চৌকর) খণ্ড খণ্ড করাইয়া এখনও হাজার টাকা বা বেশী খরচে বাঙ্গলা বৈঠকখানা করে। পাটুলির রাজাদিগের যে প্রাচীন ভগ্নপ্রায় চণ্ডীমণ্ডপ (দেওয়াল ইটের) ৫০ বৎসর পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার চালের সাজই দুহাজার টাকা গ্রাস করিতে পারে।'' এই চণ্ডীমণ্ডপ শারদোৎসবের সময় কিভাবে 'রচনা' করা হত সে সম্বন্ধে 'নদীয়া কাহিনীর' লেখক কুমুদনাথ মল্লিক লিখেছেন: ''উৎসব মণ্ডপ দেবদারু পাতায় কদলী বৃক্ষে পূর্ণকুম্ভে 'রচনার' ফলে সুসজ্জিত হইত। কাঁদি সমেত রম্ভা, কাঁদি সমেত ডাব, শাখা সহিত বাতাবী লেবু ও অন্য ফল পূজাগৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। উহারই নাম 'রচনা'। চণ্ডীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্রিত আলিপনায় চিত্রিত করা হইত। রাত্রে সর্ষপ ও রেড়ীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত।''

বাংলার সেকালের গ্রাম্যসমাজের চণ্ডীমণ্ডপের এইসব বিবরণের মধ্যে প্রাগার্য গ্রাম্য সমাজের সাধারণগৃহ ও কুমারগৃহের সমস্ত বৈশিষ্ট্য অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে। উভয়ের ব্যবহারিক বিশেষত্বের মধ্যে সাদৃশ্য তো আছেই, গঠন - পরিপাটির সাদৃশ্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওরাওঁ, ভুইঞা, মারিয়া, নাগা, গারো ইত্যাদি জাতির ডর্মিটোরিগুলি স্থাপত্য ও কারুকার্যের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাঠে খুঁটি বা দরজার গায়ে কারুকাজের তুলনা হয় না বলা চলে। ''মধ্যযুগে বাঙ্গালা'' গ্রন্থের লেখক প্রায় ২০০ বছর আগে পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দার কড়ির প্রান্তে খোদিত যে হাতির শুঁড় ও বাঘের মুখ এবং মাত্র ১০০ বছর আগে মাটির চণ্ডীমণ্ডপের চারটি কাঁঠালের খুঁটির গায়ে অদ্ভুত খোদাই করা কারুকাজ দেখেছিলেন, তা আর এখন এদেশে দেখা যায় না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিকই এই ধরনের চণ্ডীমণ্ডপ হয়ত বাংলার গ্রামে এখন আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না। মাত্র দু-চারটে ধ্বংসাবশেষে হয়ত পাওয়া যাবে। এইরকম ধ্বংসাবশেষের নমুনা আদি দু-একটা ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছি। বাংলার গ্রামে বিশেষ না পাওয়া গেলেও এখনও ওরাওঁ, হো, মুণ্ডা, জুয়াঙ, ভুঁইঞা, মারিয়া ও নাগাদের গ্রামে গেলে এর নিদর্শন বেশ পাওয়া যায়। তবে ক্রমে তারও সংখ্যা যথেষ্ট কমে আসছে, কিছুকাল পরে হয়ত আর পাওয়া যাবে না। না পাওয়া গেলেও দুঃখ নেই, কারণ নৃবিজ্ঞানীরা তার চমৎকার বিবরণ ও আলোকচিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে রেখে গেছেন, কিন্তু 'চণ্ডীমণ্ডপের' এই ধরনের ঐতিহাসিক রেকর্ড কেউ রেখেছেন বলে আমি জানি না। বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপের' কাঠের খুঁটি ও কড়ির গায়ের যেসব খোদাই করা জীবজন্তুর মূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ওরাওঁ, মারিয়া, জুয়াঙ, ভুঁইঞা এবং নাগাদের ধুমকুড়িয়া, গীতিওড় ও মোরুঙের কাঠের খুঁটি, কড়ি ও দরজার গাছে খোদাই - করা বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি মিলিয়ে দেখলে, নৃবিজ্ঞানের সন্ধানী ছাত্ররা সংস্কৃতি - সাদৃশ্য ও সংস্পর্শ বিশ্লেষণের অনেক মূল্যবান উপকরণ পেতে পারেন। সম্প্রতি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার কয়েকটি গ্রামে ঘুরে বাংলার এই 'চণ্ডীমণ্ডপের' আর এক সংস্করণ দেখেছি, তার নাম 'ভগবত-ঘর'। প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক লাইনে একটি করে 'ভগবত-ঘর' আছে। দু'একটি গ্রামে দেখলাম, ভগবতঘরের কঙ্কাল পড়ে রয়েছে, ঘর

নেই। গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ সকলে দেখলাম ভাগবতঘরে বসে রীতিমত আড্ডা দিচ্ছে, তাস পাশা খেলছে। একথা সেকথা প্রশ্ন করতে তারা বলল : 'ভগবতঘর কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সর্বসাধারণের সম্পত্তি। সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এ ঘর তৈরি করা হয়েছে। এখানে অবসরবিনোদন, খেলাধূলা, আড্ডা তো চলেই, উৎসব-পার্বণেও এ ঘর সকলে ব্যবহার করতে পারে। গ্রামের কারও ঘরে বিবাহাদি হলে অতিথি - অভ্যাগতদের এ ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয়। বাইরের অতিথিরাও এ ঘরে থাকতে পারেন।' বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উড়িষ্যার এই 'ভগবতঘর' বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপেরই' আর এক সংস্করণ এবং প্রাগার্য 'ধুমকুড়িয়া' ও 'গীতিওড়ের' পরবর্তীকালের বংশধর। কিন্তু বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ ও উড়িষ্যার এই ভগবতঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আছে। সেটা হল অর্থনৈতিক। 'ভগবতঘর' গ্রামবাসী সকলের অর্থে তৈরি, বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ, যত দূর জানি, তা নয়। উড়িষ্যার 'ভগবতঘরের' সমানাধিকারে একটা বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে, বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপের' সেরকম কিছু কোনোকালে ছিল বলে শুনিনি বা ইতিহাসে পড়িনি। গ্রামের জমিদার, অবস্থাপন্ন মোড়ল বা কোনো ব্যক্তি এই 'চণ্ডীমণ্ডপ' তৈরি করতেন, সাধারণে তা ব্যবহার করত। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের সমানাধিকারেরর দাবি অর্থনৈতিক দাবি হিসেবে ততটা গণ্য নয়, যতটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত দাবি হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের সমানাধিকার সুপ্রাচীন প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, কিন্তু অর্থনীতিগত নয়। অর্থনীতিগত নয় বলেই সেকালের জমিদারিপ্রথা ও গ্রাম্যসমাজের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপেরও অবনতি ঘটেছে। ব্রিটিশ আমলের নতুন শহর ও নগরের বিকাশের পর এবং নতুন এক পরগাছা জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টির পর গ্রামের ধনিকশ্রেনী যখন শহর নগরমুখী হয়ে উঠলেন, তখন প্রাচীন বাংলা গ্রাম্যসমাজের ভিত্ পর্যন্ত চূর্ণ হয়ে গেল এবং বাংলার চণ্ডীমণ্ডপও ধীরে দীরে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল। চণ্ডীমণ্ডপের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল চৈতন্যমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পালাগানও কতকথা, কবিগান, পাঁচালী গান, লোকোৎসব, পূজাপার্বণ, গ্রাম্য বিচারশালা, অতিথিশালা, ক্লাবঘর, আলোচনা ও মজলিশগৃহ, এমনকি গ্রাম্য পাঠশালা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেল। এককথা, সেকালের গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হিন্দুযুগ ও পাঠন - মোগল যুগ মিলিয়ে যে সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত মধ্যযুগ, তার প্রায় অবসান ঘটল।

চণ্ডীমণ্ডপ একটা 'ইনস্টিটিউশন'

সুতরাং 'চণ্ডীমণ্ডপ' শুধু একটা সুদৃশ্য মণ্ডপ বা গ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট সর্বসাধারণের গৃহ নয়। চণ্ডীমণ্ডপ একটা 'ইনস্টিটিউশন' বিশেষ। বাঙালীর লৌকিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিচিত্র উৎসব থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে মিলিত হয়েছিল একদিন। প্রাগার্য যুগের চাণ্ডী দেবতার পূজা ও উৎসব যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের চণ্ডীপূজা ও মঙ্গলচণ্ডীর পালাগানে পরিণত হল, অনার্য 'চণ্ডী' যখন হিন্দু 'চণ্ডী', মঙ্গলচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, শুভচণ্ডী বাঙালী হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপে রূপান্তরিত হল। চণ্ডীঠাকুরের আস্থানে বা মঙ্গলচণ্ডীর পালাগানের জায়গায় মণ্ডপ তৈরি করে নাম দেওয়া হল 'চণ্ডীমণ্ডপ'। তার সঙ্গে প্রাগার্য গ্রাম্যসমাজের কুমারগৃহ ও সাধারণ লোকগৃহ 'ধুমকুড়িয়া', 'গীতিওড়', 'ঘোটুল', 'মারুং' প্রভৃতির ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়ে বাংলার চণ্ডীমণ্ডপকে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপ দিল এবং তার ঐতিহাসিক ধারাবহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখল। চাণ্ডীটাঁড় এবং ধুমকুড়িয়া মোরুঙের মতন 'চণ্ডীমণ্ডপ' ও বাংলার গ্রাম্যসমাজ, লোকোৎসব ও লোকসংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো। পরে যখন শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রচলন হল বাংলাদেশে, তখন চণ্ডীমণ্ডপ শারদোৎসবের সাধারণগৃহে পরিণত হল। চণ্ডীমণ্ডপের ইতিহাস তাই একটা 'ইনস্টিটিউশনের' ইতিহাস, একটা যুগের ইতিহাস, বাংলার সেকালের গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির ইতিহাস, লোকোৎসব ও লোক-সংস্কৃতির ইতিহাস। দুঃখের বিষয়, সে ইতিহাস লেখা হয়নি আজও, লেখেননি কেউ। প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আজও তার ইতিহাস লেখার হয়ত চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তার অনেকটাই অনুমান ও কল্পনায় ভরাট করে নিতে হবে এবং চিরদিনের মতন লুপ্ত বহু উপকরণের জন্যে আফশোস করতে হবে।

বিলুপ্ত চণ্ডীমণ্ডপের জন্য দুঃখ করছি না। ঐতিহাসিক নিয়মে একটা যুগ গেছে, তার সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপও গেছে, তাতে দুঃখ করবার কি আছে? কিন্তু দুঃখ হয় এইজন্য যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিক চণ্ডীমণ্ডপের প্রত্যক্ষ বিবরণ বিস্তারিতভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ করে রাখেননি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক আবহাওয়ায় ইট পাথরের কীর্তিস্তম্ভ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। চণ্ডীমণ্ডপ অন্তত প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সংরক্ষণের চেষ্টা করতে পারতেন, নিদেনপক্ষে দু-চারটে মূর্তি খোদাই করা কাঠের খুঁটি, কড়ি, দরজা এবং চালের টুকরো একটু-আধটু। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের 'স্মৃতি' ছাড়া আর কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। এইজন্য দুঃখ হয় এই কারণে যে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির যে ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তিরূপে চণ্ডীমণ্ডপ তৈরি হয়েছিল সেকালে, সে ধারা একালে অক্ষুণ্ণ রেখে তার বদলে রূপান্তরিত কিছু আমরা পাইনি। এ যুগের টাউনহল, ক্লাবঘর, টি বা কফিহাউস, সিনেমা হাউস ইত্যাদি যদি সে যুগের চণ্ডীমণ্ডপের নতুন রূপ হয়, তাহলে বলতে হবে যে, যুগের দিক থেকে আমরা এগিয়ে গেলেও জাতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমরা জাতিগতভাবে বোধহয় পিছিয়ে এসেছি। 'জাতিগতভাবে' এইজন্য বলছি যে, আমাদের এই বিচিত্র ধনতান্ত্রিক যুগের নগরসভ্যতা ও নগরসংস্কৃতির উন্নতি অনেকটা 'ব্যক্তিগত' উন্নতির মতন। গ্রামকে আকণ্ঠ শোষণ করে নগর ও শহরের শ্রীবৃদ্ধি, গ্রাম্যসমাজকে ধ্বংস করে একটা কিম্ভূতকিমাকার নির্বিকার নাগরিক সমাজ গঠন, একের স্বার্থে বহুর অনিষ্ট সাধন ছাড়া কি? গ্রাম্যসমাজ ভেঙে দিয়ে আমরা বাংলার 'চণ্ডীমণ্ডপ' ধ্বংস করেছি, কিন্তু তার বদলে সেখানে নতুন যুগোপযোগী কোনো সমাজ গঠন করিনি, এবং বাঙালির জাতীয় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, নতুন খাতে নতুন রূপে সেই বিচিত্র ধারার প্রবাহের জন্য, সেখানে 'চণ্ডীমণ্ডপের' বদলে নতুন কোনো মণ্ডপও গড়ে তুলিনি। এই হল আমাদের জাতীয় অবনতির সবচেয়ে বড় কারণ চণ্ডীমণ্ডপের বিলুপ্তি তার একটা লক্ষণ মাত্র।

১৩৫৯ সন

সৌজন্য : বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব / অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৮৬।